দ্বা সুপর্ণা
স্বপ্না ভট্টাচার্য

ওরা দু-জন একসাথেই থাকে। একে অন্যকে ছেড়ে যেতে পারে না। আপনারা হয়তো ভাবছেন ওরা কারা? হ্যাঁ সে প্রশ্ন তো মনে উঠতেই পারে। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর আপাতত মুলতুবি থাক। আমরা শুধু জানি ওরা একসঙ্গেঁ আছে। একইসঙ্গে খায়-ঘুমোয়-উঠে-বসে-ঘুরে বেড়ায়। এক পলকও ওরা পরস্পরকে ছেড়ে যায় না। কায়া ও ছায়ার মতো ওরা। ওদের বয়স, লিঙ্গ হয়তো জানি, হয়তো বা জানি না। শুধু জানি ওরা এক সঙ্গে থাকে। একে অন্যকে এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য নেই। কিন্তু আশ্চর্য কী জানেন ওরা কিন্তু স্বভাবে বিপরীতধর্মী। এই তো সেদিন একজনের হঠাৎ মন খারাপ হল। কীসের জন্য মন খারাপ নিজেই জানে না। সারাদিন ওর দেখা নেই। যেন নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে চায়। কোনো এক সম্পন্ন গৃহস্থের ভাঙা পরিত্যক্ত পুকুরঘাট। চারদিকে বেড়ে উঠছে জঙ্গল বড় বড় বনস্পতি- অজানা পাখির কলকাকলি। সেই শ্যাওলা ভাসা মজা পুকুর ঘাটে গিয়ে একজন মন খারাপ করে বসে আছে, নড়া নেই চড়া নেই- স্থির চিত্রের মতো; মজা পুকুরে চোখ নিবদ্ধ করে চেয়ে আছে। যেন নার্সিসার দৃষ্টি যেন শ্যাওলা পানা ভেদ করে পুকুরের ঘোলা জলে আত্ম প্রতিকৃতি দেখতে চায়। তার যেন অতীত নেই-বর্তমান নেই-নেই ভবিষ্যৎও। অন্যজন তখন তাকে খুঁজে বেড়ায় হন্যে হয়ে। ঐ যে বললাম ওরা একজন আরেক জনকে ছেড়ে যেতে পারে না। সে তাকে আবিষ্কার করে সেই পোড়া বাড়ির পুকুর ঘাটে। নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার মতো— পণ করেছে দেখবে সে নিজের মুখ-পুকুরের ঘোলাজলে। নিশ্চেতন এক কাঠপুতুলি! রাগে জ্বলে ওঠে আরেকজন। ওকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ওঠে— —'তুই আবার এখানে! জোম্বীর মতো বসে আছিস? ওঠ! ওঠ বলছি! জোরে খামচে ধরে তার চুল— প্রাণপণে টানতে থাকে ওকে। ওঠে দাঁড়া-দাঁড়া বলছি। কোথায় হারিয়ে যাস ক্ষণে ক্ষণে! কিন্তু নড়াতে পারে না। চলতে থাকে লড়াই- চলতেই থাকে।

আপনারা ভাবছেন, এটা আবার কী রকম! একসঙ্গে থাকে অথচ এত বিরুদ্ধতা! তবে থাকেই বা কেন? একটা তো কারণ চাই। ওরা একে অন্যকে ছেড়ে গেলেই হয়! কিন্তু ছেড়ে যেতে পারে কই! এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে—

আচ্ছা ওদের স্বভাব কী তা তো বলিনি। ওদের দুটো নাম দেওয়া যেতে পারে। নাম তো কেউ স্বভাব জেনে দিতে পারে না। স্বভাব গড়ে ওঠার আগেই নামকরণ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যেহেতু ওদের স্বভাব কিছুটা জেনে গেছি তাই নাম দিয়ে দিতেই পারি। একজন সদা হাসি খুশি থাকতে ভালোবাসে— তাকে না হয় 'ডিলাইট ফুল ডিলাইলা'ই বলি। আবার হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে নামের আগে বিশেষণ বসিয়ে কি নামকরণ হয়? তা অবশ্য হয় না, কিন্তু ওদের যা প্রকৃতি— তাতে বিশেষণ তাদের সবিশেষ করবে, তাই না? আর অন্যজন, দুঃখ রাজার কন্যা। সূর্যের আলো তার সয় না। মাতাল হাওয়ায় মন হুহু করে ওঠে। ফুল পাতা প্রজাপতি দেখলে ওর ভেতর থেকে উঠে আসে হাহাকার- 'যাসনে ওখানে।' ও জানালা দরজার পর্দা টান টান করে রাখে পাছে আলো আসে। কান্না-ভেজা সুরে গান গায়— 'আঁধার রাতের একলা পাতাল।' তাকে নাম দিলাম 'স্যাডিস্ট সারিনা।'

কী অদ্ভুত! এই বয়ানে সবই এলোমেলো। তাদের ইংরেজি নাম দেওয়ার অর্থ কী! আমি বলি কী এসব এখন কেউ ভাবে না। হঠাৎ কেন জানি এ নাম দুটোই আমার মনে চলে এল। আর ইংরেজি শব্দ প্রয়োগের মধ্যে একটা আধুনিকতা বা স্মার্টনেস আছে বলে অনেকেই মনে করেন। আর যেহেতু আপনাদের উদ্দেশ্য করে কথা বলছি- তখন সবার ভাল লাগা না লাগার কথা তো মনে আসতেই পারে। আর খুব ভেবেও যে নাম দুটোর কথা বলছি তা নয়। ঝাপসা অতীতে হয়তো কোথাও পেয়েছিলাম শব্দগুলো- লুপ্ত স্মৃতি বেয়ে ওঠে এল মনে। আর আসল কথা হল নামে কী আসে যায়। আর এখন তো সাজ-পোষাক-খাদ্যাখাদ্য— সব মিশে একাকার। তাই আজকাল দক্ষিণ-পশ্চিম সবদুয়ারই অবারিত। তাই এতে আমাদের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

এই তো সে দিন ডিলাইলা- খুব ব্যস্ত, কোথাও পার্টিতে যাবে। মনে উত্তেজনা। কিন্তু স্যাডিস্ট সারিনা শুয়েই আছে-শুয়েই আছে। বালিশের পাশে, বিছানায়, টেবিলে ইতিউতি কিছু বই। ঘর অন্ধকার। সন্ধ্যা উতরে গেছে আলো জ্বালেনি। আলো- জ্বালালে রেগে যাবে। ডিলাইলা সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে দেখছে— এঘর ওঘর করছে— ডাকতে সাহস পায় না। পারলে ও উড়ে চলে যায় পার্টিতে। কিন্তু সারিনা? সারিনা ওকে পিছু টানে। নড়েনা, চড়েনা-অন্ধকার ঘরে একচাপ অন্ধকার হয়ে শুয়ে আছে। ডিলাইলা ওকে চাপড় মারতে গিয়েও পারে না। কারণ তারপর লাগবে ধুন্দুমার কান্ড। এত রাগ করবে যে যাওয়াই পণ্ড হবে। চুল ছিড়বে- মাথা চাপড়াবে, কাঁদবে, বইপত্র ছুঁড়ে ফেলবে। তখন কে সামলাবে? প্রবল ঘূর্ণিঝড় হবে। তারপর যখন সারিনা যিতু হবে

তখন অনেকখানি অশ্রু বয়ে যাবে পানা পুকুরের দিকে তারপর অশ্রু নদীর সুদূরপারে ঘাটের ছায়া ধীরে ধীরে দেখা দেবে।

কিন্তু ডিলাইলা এসব মেনে নেয় কারণ সারিনাকে ছেড়ে তার অস্তিত্ব থাকে না। সারিনার বেহিসেবি রাতের তাণ্ডবে ডিলাইলা ঘাপটি মেরে বসে থাকে। ওর মনে তখনও কোকিল ডাকে চুপিচুপি, এরই মধ্যে ডিলাইলা সাজগোজ সেরে নেয়। চোখে মাস্কারা - গালে রোজ- এসেন্স গন্ধস্নান করে নেয়। গাঢ় লিপস্টিকে নিজেকে সাজায়। আয়নায় নানা ভঙ্গিমায় নিজেকে দেখে ভেজা শালিখের মতো দূর থেকে দেখে। মোছে... তারপর...ডিলাইলা তাকে টেনে নিয়ে ঠিক বেরিয়ে যায়। সারিনা তখন শান্ত; কেমন যেন লুলেবি- শোশ শিশুর মতো! নাহ! নিজেকে নিয়ে পারা যাচ্ছে না। বারবার ইংরেজি শব্দ এসে যায়... 'ঘুম পাড়ানিগান' ও তো বলতে পারতাম! আসলে কী জানেন দু'শো + আটাত্তর বছরের ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি চর্চার অভ্যাস কি ছাড়তে পারি? ভুল তো হবেই। যাক ঘুমপাড়ানির গান শুনতে শুনতে সারিনা নির্জীব হয়ে লেপটে থাকে ডিলাইলার সঙ্গে। সেও তাকে ছেড়ে যেতে পারে না। ডিলাইলা নাচতে ভালোবাসে। তার উপস্থিতি আনন্দে ভরিয়ে দেয় সবাইকে। ডিলাইলার কোনো পিছুটান নেই। সে উদ্দাম-উধাও। সংসার সমাজ- দেশ তার কাছে বন্ধন হতে পারে না। কিন্তু সারিনা? সে তাকে এলিয়টের কবিতা শোনায়- 'This is the way the world ends' কেন শোনায়? তার পায়ে কি শেকল পরাতে চায়? কিন্তু তবুও ডিলাইলা তাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না।

আপনারা ভাববেন, কথা নেই বার্তা নেই কোত্থেকে দুজনের কথা শুরু হয়ে গেল। তারা কে কী করে, কেনই বা একসাথে থাকে! চরিত্রে ওরা যদি এতই আলাদা তবে একসঙ্গে থাকেই বা কেন? ন্যায্য প্রশ্ন। কিন্তু সব তো নিয়ম মেনে হয় না। তাসের দেশের প্রজা তো সবাই হতে পারে না। আর এই দু-জনেরও তো নিশ্চয়ই ভেতরে-ভাঙাগড়ার ইতিহাস আছে। নিশ্চয়ই এরকম হঠাৎ করে কেউ হয় না। তার পরিবেশ তাকে তো নিয়ন্ত্রণ করেই। আরও পিছিয়ে যদি কারণ অনুসন্ধান করি তবে হয়তো রাজনীতি ও অর্থনীতিও এরমধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। আসুক, তবুও এসব নিয়ে ভাবব না। বিষয়টা আপনাদের উপরই ছেড়ে দিলাম।

সেদিন মেঘ করেছে আকাশে। সারিনা চুপটি করে পর্দা সরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। হাতে বোর্হেসের বই আধ খোলা। ক্যাবলের তারের উপর বসে আছে দুটো শালিখ। সারিনা ভাবে দুই শালিখ দেখলে আনন্দ হয়। আর তক্ষুনি তার মনে হয় আনন্দ তো তার জন্যে নয়। সে- কী ভাবছে! তার জন্যে কৃষ্ণবিবর, তার জন্যে বঞ্চনার পাহাড়। পথিক বন্ধুরা- সহপাঠীরা তাকে ফেলে সব দূর দূরান্তে চলে গেছে। কেউ

ব্যাঙ্গালুরু, কেউ চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, দিল্লি- কেউ বা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশ। কেউ সোলো ভ্রমণে বিদেশ ঘুরে। ট্রেকিং এ যায়। আর সারিনা এই মফস্বল শহরে খাঁচায় বন্দি। অফিস-বাসা, আর বাসা-অফিস করে তার সোনার দিনগুলো বয়ে যায়। কোথাও যাওয়া হল না তার। খাঁচা? কীসের খাঁচা? সে কি জানে? খাঁচার ভেতরে বই ইশারা দেয় কিন্তু সে নিরুপায়। তার পশ্চিমের জানালা খোলে না। আঁধার আরও ঘনিয়ে আসে। মেঘের পরে মেঘ জমে। সারিনা পর্দা টেনে দেয়। ডিলাইলা চুপি চুপি সব দেখে। বোঝে। মাথায় রাগ চড়ে যায়। দৌড়ে এসে হ্যাঁচকা টানে তুলে নিতে চায় ওকে।

— ওঠ। ওঠ সারিনা।

—টানাটানি করিস না। এক্ষুনি তো জ্ঞান ঝাড়বি। তোরা সবাই মিলে আমায় নষ্ট করে দিলি। ডিলাইলা ওকে জাপটে ধরে। সারিনা কেঁদে ভাসায়। অশ্রু নদী হয়ে পাশ পুকুরে মিশে যেতে থাকে।

—ওঠ। সারিনা। চল-মাল্টিপ্লেক্সে যাই। মল ঘুরে আসি। খাওয়া দাওয়া করলে মন ভালো হবে। তোকে না হয় নখপালিশ কিনে দেবো। বই রাখ তোর কি পরীক্ষা যে পড়তে হবে? সারিনা শুয়ে থাকে, শুয়েই থাকে।

সারিনার কী হয়েছে, আপনারা ধরতে পারছেন কি? সারিনা এমন ছিল না। সারিনার শৈশবে ‘বিউটি পার্লার’ ছিল না। তারপর সুস্মিতা সেন এসে বিশ্বজয় করে নিল। তখন সারিনা জানত না পুরুষ ও নারীর কসমেটিকস আলাদা। মেয়েরা শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার কামিজ হয়ে- শার্ট প্যান্ট। এখন প্রায় টপলেস! সারিনা প্রযুক্তি-বিশারদ- ম্যানেজমেন্ট পড়লেও আর্থনীতির সামাজিক তাৎপর্য বোঝে না। ডিলাইলা এসেছে সুস্মিতার পথ বেয়ে। আর তখন থেকেই সম্পর্কের শুরু। সারিনা এখন বই পড়ার চেয়ে মোবাইলে চোখ রাখে বেশি। সারাদিন ফাঁক পেলেই জোম্বি মারে। মোবাইল সারিনার অনুক্ষনের সঙ্গী। ডিলাইলা নাছোরবান্দা হয়ে ওকে জন্মদিন, বিয়ের পার্টিতে নিয়ে যায়। তখন উৎসব ভবন জুড়ে স্বর্গের হুরিরা নামে। দেশি-বিদেশি খাদ্যের সুবাস তাকে ডিলাইলার সঙ্গে আনন্দে অংশীদার করে নেয়। তখন কোথায় কী! সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত গভীর হয়ে এলেও সারিনা ছায়াপথ হয়ে জেগে থাকে। তখন ডিলাইলা ও সারিনা একাত্ম হয়ে যায়। ডিলাইলা তখন চুপি চুপি সারিনাকে চিমটি কাটে। সারিনা অবাক চোখে তাকায়। কাঁদে না। উদাস চোখে ক্ষণিকের আলোর ঝলক। কিন্তু রাত গড়িয়ে দিন এলেই ও ঘরের দরজা জানালার পর্দা টেনে দেয়। যেন ঘরে আলো ঢুকতে না পারে। ও কি রঞ্জনের ও পিঠ? বই এলোমেলো ছড়িয়ে থাকে ঘরে। নিঃশব্দে ডাকে তাকে। কিন্ত তার মন যেন অসাড়।

প্রশ্ন হল, যে দু-জন হরিহর আত্মা- ওরা কি স্বয়ং সম্পূর্ণ? মা-বাবা- আত্মীয়স্বজন —বন্ধু-বান্ধব পাড়ায় প্রতিবেশী- অফিসের কলিগ- ওরা সব কোথায়? এই যে দু-জন সারাদিন আনন্দে-কলহে মেতে থাকে- তা কি অদৃশ্য ?

সারিনা ভেসে বেড়ায়। ডিলাইলাও।

অফিসে যায়— মরমে মরে থাকে। কেন?

কাজ করে— আবার নিজের ওপর বিরক্তও হয়।

মন্দিরে যায়— কিন্তু ভিড় থেকে একটু দূরে সরে থাকে।

মলেও যায়— কী যেন খোঁজে।

রেস্টুরেন্টে যায়— জমজমাট পরিবেশে আড্ডায় নিরিবিলি বসে থাকে। আবার না-পড়া বইয়ের জন্যেও মন খারাপ করে।

সারিনা ও ডিলাইলা এভাবে সর্বক্ষণ পরস্পরের সঙ্গী। অথচ তবু যেন কাছে থেকেও দূর রচনা করে ওরা।

ডিলাইলা বোঝে, সারিনা ওকে আচ্ছন্ন করে রাখতে চায়। সে কি কোনো গোপম ঈর্ষা। সারিনা কি ডিলাইলা হতে চায় না? আর ডিলাইলা কী চায় সে নিজে কি বোঝে?

—চল সারিনা নাটক দেখে আসি।

—নাহ। নাটক আমার ভাল্লাগে না।

—চল না, সবার সঙ্গে দেখা হবে...

—ওখানে কেউ আছে নাকি!

—তাহলে চল গান শুনতে যাই। গান তোর ভালো লাগেনা?

—কে বলে লাগে না? অরিজিৎ সিং আমি খুব ভালোবাসি।

—তাহলে চল নদীর তীরে ঘুরে আসি।

—নদী দেখলে আমার কান্না পায়।

—কী যে বলিস যা তা!

—হ্যাঁ আমি তো পচা ডোবা!

—চুপ কর সারিনা। তুই মিছে কেঁদে মরিস। তুই আমায় ছাড়তে চাইছিস, না?

—তোকে ছাড়লে আমার থাকে কী বল্।

তারপর দু-জনে নীরবতার শরিক হয়। সেই নীরবতায় যত আলো তত অন্ধকার। এরই মধ্যে সুর গুন গুন করে ওঠে তবু গান জাগে না।

সারিনাকে সারামাগো ডাকে। য়োসা ডাকে অহরহ। কিন্তু সে সাড়া দিতে পারে না।

কদিন থেকে সারিনা তেমন শুয়েও থাকে না। রোজ ওর জানালায় একটা শালিখ পাখি এসে বসে। ডিলাইলা দেখে, সারিনা হাতছানি দিয়ে পাখিটাকে ডাকছে। তখনই

একটা কটাশ- ভোগেনভিলার ডাল বেয়ে পাখিটাকে ধরতে এলে সারিনা চমকে ওঠে। হুস্ হুস্ শব্দ করে কটাশ তাড়ায়। ডিলাইলা তাকিয়ে দেখে। সারিনাকে মনে মনে বলে- 'to be or not to be, that's the question!' তারপর চুপিচুপি এসে সারিনার দু-চোখ চম্পাকলির মতো পাঁচ আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ফিস্ ফিস্ করে বলে-

— 'বলতো আমি কে?

বাহ্! রে, তুই কে আমি বুঝি জানি না!

খুব তো পাখি দেখছিস আজকাল। কী ওটা?

নীলকণ্ঠ?'

নিরুত্তর সারিনা জামালার পর্দা টেনে দেয়। আলোর ছটা ঘর থেকে সরে যায়। নিরিবিলি অন্ধকারে দু-জন বসে থাকে। কিন্তু সারিনা অশ্রুমতী হয় না আজ।

অফিস-ফেরত ডিলাইলা একটা সুন্দর পাখির খাঁচা কিনে আনে, লালরঙের। খাঁচাটা খুব সুন্দর। সারিনাকে চমকে দেবে বলে বাইরে বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখে। আজ সারাদিন সারিনা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। বালিশের পাশে মোবাইলে গান বাজছে- 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইলনা কেহ!'...

অন্ধকার ঘরে মেঘ হয়ে শুয়ে-থাকা সারিনা নিজেও যেন এক আবছায়া। সাড়া নেই শব্দ নেই।

—কী রে উঠবি না? তুই কখন ফিরেছিস?

কোন জবার নেই।

—ওঠ! দেখ না কী এনেছি।

কোনো সাড়া নেই।

—এই সারিনা— ওঠ। ওঠ। চুল ধরে টেনে তুলব ওঠ বলছি।

ডিলাইলা আলো জ্বালে। সারিনা ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত বিষণ্ণ মুখে তাকায়।

—চেঁচাচ্ছিস কেন?

—ওঠ। তোর পাখির জন্যে খাঁচা এনেছি।

—খাঁচা? তুই কেন এনেছিস?

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে সারিনা। বলে, সরা, সরিয়ে নিয়ে যা। নিয়ে যা বলছি! ডিলাইলা ওকে থামাতে পারে না। যেন আচমকা ঝড় উঠেছে। দাপাদাপি চলে ঝড়ের। ডিলাইলা

চুপচাপ বসে থাকে, উদাস।

পরদিন সকালে গুটি গুটি পায়ে সারিনা ডিলাইলার পাশে এসে বসে।

—রাগ করেছিস?

ডিলাইলা চুপ করে থাকে।

—কথা বল। জানিস তো তুই ছাড়া কেউ নেই আমার। আমি তো পরবাসে আছি। তুই ও আমার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিবি? ডিলাইলা একটু নড়ে চড়ে বসে।

বলে —

—অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছিস তুই।

আমি তোর কে?

—তুই কী চাস বল তো? 'আমার সমস্ত ভেঙে দীর্ঘ হতে চাস?'

বলতে বলতে কাঁদে সারিনা। কেঁদেই চলে। সেই অশ্রু নদী হয়ে পানা পুকুরের দিকে বয়ে যায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে,

—আমার এতো ভালোবাসার বইগুলোও আমাকে বাঁচাতে পারল না।

—দূর—! যতসব ছাতামাথা। সব ঠিক আছে।

ডিলাইলা সারিনাকে হাত ধরে ওঠায়। চোখ মুছিয়ে দেয়। বলে,

—কাঁদিস না সারিনা; চল না আমরা দু-জনে মিলে নতুন করে একটা কিছু আরম্ভ করি। সারিনা ডিলাইলাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। দু-জনে দুজনের বুকের ধুকপুক শোনে।

আপনারা হয়তো ভাবছেন, এসব কী! ওরা কেন একসঙ্গে থাকে? কী চায় ওরা? এভাবে কি থাকা যায়? ওদের দুঃখও তো ঠিক বোঝা যায় না।

কী করব বলুন, জীবন তো সরল অঙ্ক নয়। তাছাড়া পাওয়া না পাওয়ার গল্প জেনে আমাদেরই বা কী লাভ? জীবন তো নদীর মতো এঁকে বেঁকে চলে। যত আলো তত ছায়া।যত দিন তত রাত। ঘুমের পরেই জাগরণ। এভাবেই চলছে সব কিছু। সারিনাকে কিছু বই হয়তো পথ দেখায়; কিন্তু সেই পথ ধরে চলার ইচ্ছে- তা তো সারিনাকেই জাগিয়ে রাখতে হবে। সারিনা যদি সকল বন্ধুদের মতো কর্পোরেটের চাকরি করতে চায় আর না পাওয়ার দুঃখে নিজের ওপর রেগে যায়- কারই বা কী করার থাকে! মাঝে মাঝে 'to be or not to be' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুঃখ পুষতে থাকলে ডিলাইলাই বা কী করতে পারে! অথচ বড় শহরের হাতছানি ওকে উতলা করে। বই পড়তে যে এত ভালোবাসত তার ও গ্রহণ লাগে। না পাওয়ার কষ্ট যত তার মধ্যে ফুঁসতে থাকে, সারাদিন মাম জোম্বী না মেরে তার উপায় কী! নক্ষত্রের দোষ যদি তার সম্ভাব্য প্রেমের পথে বাধা দিয়ে যায়, সে তো অন্ধকারের সারাৎসারে ডুবে যাবেই। যাচ্ছেও তাই। আবার সে এও বোঝে, ঠিক এইজন্যেই তার ডিলাইলাকে চাই। কোনো কারনে ডিলাইলা যদি তাকে ছেড়ে যায়, সে কি মহাশূন্য হবে না?

ডিলাইলা ও সারিনার গল্প এখানেই শেষ হতে পারত। কারণ না পাওয়ার দুঃখ তো শেষ হওয়ার নয়। তবুও যেন কিছু কথা বাকি রয়ে যায়। না, ডিলাইলা সারিনাকে ছেড়ে যায়নি। বরং সে কেয়া শেঠির কসমেটিকস্ কিনে নিজেকে সাজায় এখন। কেন সাজায়? আপনারা এই প্রশ্ন করতেই পারেন। সারিনার সঙ্গে থাকতে থাকতে ওর--- বিষাদে সংক্রামিত হয়ে যাওয়ার কথা। তা কিন্তু হয়নি। সে পণ করেছে, কিছুতেই সারিনাকে ছাড়বে না। তাই ইদানীং সারিনাকে নিয়ে নতুন নতুন খাবার খেতে যায়। কীভাবে সারিনা উৎফুল্ল হতে পারে, সেই চেষ্টাই করে। আপাতত ডিলাইলা ঠিক করেছে জিম করবে, নাচ শিখবে। আর, বাইক চালিয়ে দু-জনে মহা সড়কের পথে উধাও হয়ে গাইবে ‘কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।’ তবে মনে মনে নয়, কাজেই করবে। ওদের একসঙ্গে থাকার তাৎপর্য সবাইকে বোঝাতেই হবে। সারিনাকে ফিরিয়ে আনবে বইয়ের দুনিয়ায় আর নিজে হবে গতিময়।

মজা পুকুর পাড়ের আস্তানা ছেড়ে ওরা চলে এসেছে বড়াইল পাহাড়ের সবুজ গালিচা বিছানো এক জনপদে। অদূরেই উৎরাই। ডিলাইলা এখন সারিনাকে নিয়ে লং ড্রাইভে বেরোয়। বলে

—চল তোকে পাহাড়ের উপর থেকে জাটিঙ্গা নদী দেখাব। জলের স্বচ্ছ ধারা দেখতে কত ভালো লাগে, দেখবি। আশ্বিনের পাগল করা রোদ দেখাব তোকে। দেখাব মিহি কুয়াশা ঘেরা নীল পাহাড়। রাতের আকাশের কাল পুরুষ দেখাব, দেখাব ভেদে....

সারিনা এখন আর কাঁদেনা। এতদিনে সে জেনে গেছে: ‘এই পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।’

সারিনা আবার এলিয়ট পড়তে শুরু করেছ, সারামাগো পড়ছে, য়োসা পড়ছে। আসলে নতুন ভাবে খুঁজছে। খুঁজতে শিখছে নিজেকেই। আপনারা হয়তো ভাবছেন, এই দু-জনের ঝগড়া মিটে গেল কী করে! আসলে ঝগড়াটাই তো মেকি! সেই মজা পুকুরটা ওরা তো ছেড়ে এসেছে। এখন তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যায় ছোট একটি নদী। সেই নদীতে স্রোত কখনও বেশি, কখনও কম। সারিনা আজকাল নদী-তীরে বসে থাকে। স্রোতধারায় চোখ রাখে। ডিলাইলা আর রাগ করে না, সারিনাকে লুলেবি শোনায়। সারিনাও যেন ডিলাইলাকে দেখে বলে-তুই এখন মেক আপ করিসনা?

ডিলাইলা ঠোঁট চেপে হাসে। তার চোখে নক্ষত্রের আলো। সেদিকে সারিনা তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। দু-জনে বাইক চড়ে ঘুরে বেড়ায়। কোনও দিন যায় মনিপুর রোডে, কোনো দিন আইজল রোডে দেখে কীভাবে মেতে উঠছে শহর। হ্যাঁ সারিনা এখন মোবাইল থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে বইয়ের দিকে।

আপনারা হয়তো ভাবছেন, এতটা পরিবর্তন কী করে হল? ডিলাইলাই কি সারিনার মুখ ফিরিয়ে দিল? এখানেও গল্পের ভেতরে আরেকটা গল্প আছে। মোবাইলে জোম্বী মারতে মারতে সারিনা একসময়ে হয়রান হয়ে পড়েছিল। কালো কুৎসিত বিকৃত চেহারার সব প্রেত মানুষ উঠে আসছিল অন্ধকার কবর থেকে।... যাকে তাকে ছুঁয়ে দিচ্ছিল, কামড়ে দিচ্ছিল আর বংশ বৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছিল জোম্বীর। ওরা মানুষের মাংস খায়। কারা এই জোম্বী?

—ডিলাইলা একথা জিজ্ঞেস করেছিল।

—হঠাৎ করে বাচ্চাদের কম্পিউটার গেমে কীভাবে ঢুকে পড়ল? সত্যিই কি জোম্বী আছে?

তারপর সারিনা বলেছে যে পশ্চিম আফ্রিকার লোক বিশ্বাসে ভোডু নামে অপদেবতা আছে। যারা 'man without soul and soul without body' এরাই জোম্বী। আমি এদের সহ্য করতে পারি না তাই মেরে দিই। গোগোল দাদাকে জিজ্ঞেস কর। তারপর খুল যা সিমসিম। প্রশান্ত মহাসাগরে তাহিতি দ্বীপ— সেখানেই গিয়েছিলেন বিখ্যাত আঁকিয়ে পান গগ্যাঁ। য়োসা লিখেছেন তার আশ্চর্য জীবনকথা।

...'The way to paradise'! জানিস, ছবির পরে ছবি এঁকেছেন তিনি। এরমধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল 'আমরা কোথা থেকে এসেছি... কোথায় রয়েছি... কোথায় যাব'।

ডিলাইলা বলে:

—আমাকে দেখাবি?

সারিনা বলে: দেখনা, আছে তো আমার কাছে। জানিস, গগ্যাঁ গিয়েছিলেন একেবারে আনকোরা মুক্ত মানুষের হাবভাব আর তার প্রকাশ খুঁজতে। ডিলাইলা স্তব্ধ হয়ে শোনে। আবার দু-জনের ঘর সেজে ওঠে বই দিয়ে...আলো দিয়ে। যেন পর্দা সরে গেছে ঘরের। অরুণ আলো দু-জনের ঘুম ভাঙায়। সারিনাও এখন শান্ত হয়ে গেছে। ডিলাইলা অবশ্য এখনও সারিনাকে লুলেবি শোনায়।

এভাবে ডিলাইলাকে সঙ্গে রাখছে সারিনা। আর ডিলাইলাও সারিনাকে। যে-জীবন ওরা গড়ে তুলছে এভাবে, তার গল্প আমি কতটা লিখতে পারব
সে বিষয়ে নিশ্চিত নই। ওরা বরং নিজেরাই ওদের কথা বলুক।

ভোরের আলোয় চোখ রেখে সারিনা বসে আছে। চোখ দূরে নিবদ্ধ। পাহাড় পেরিয়ে পাহাড়, তারপর নীলাকাশ...

ডিলাইলা তার চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়ায়।

—সারিনা! এই সারিনা!

—কী বল না।

—চুপচাপ বসে আছিস যে!

—দেখছি!

—কী দেখছিস? আকাশ নাকি...

—কিছুই না

—তোর রাগ হচ্ছেনা?

—না।

তোর নীলকন্ঠ পাখির খোঁজ পেয়েছিস বুঝি?

সারিনা ঘাড় ঘুরিয়ে ডিলাইলার মুখের দিকে তাকায়। চোখে জোৎস্না ঝরে পড়ে।

ডিলাইলা দু-হাতে সারিনার গলা জড়িয়ে ধরে। অরুণ আলো এখন সোনা ঝরায়। বাইরে গাছের পাতায় মৃদু হিল্লোল। নদী কলকল শব্দে বয়ে যায়...

আমার কথাটি কি ফুরোলো?